পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারে : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রাসঙ্গিকতা (১৯৬০-১৯৮৩)

উম্মে হাবিবা ইয়াছমিন*

[সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের এক-দশমাংশ এলাকা জুড়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম যেখানে বাঙালি ছাড়া ছোট বড় প্রায় ১৪টি আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করছে কিন্তু ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে তাদের অধিকাংশই ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর। মূলত তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অব্যবস্থাপনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুকাল থেকে প্রবর্তিত ও প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কারণে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি গঠিত হলেও ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ কোনও পরিকল্পনা করা হয়নি এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কিন্তু ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে যখন অনেক আদিবাসী উদ্বাস্তু হয়ে যায় তখন তারা সবাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হয়েছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বেই তখন পাহাড়ি জনগোষ্ঠী নিজেদের উদ্যোগে অনেক অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। তিনি জুম্মগোষ্ঠীর মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার করেছিলেন এবং শিক্ষাকে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন শিক্ষাবিস্তার হয়েছিল অনেক বেশি। এই গবেষণা কাজে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় প্রকার উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত এটি বর্ণনামূলক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হবে। আলোচ্যমান প্রবন্ধে এম এন লারমার উদ্যোগে কীভাবে পার্বত্য চট্টগামে শিক্ষাবিস্তার হয়েছিল; তিনি কী কী অবদান রেখেছেন শিক্ষাবিস্তারে এবং এক্ষেত্রে আগত প্রতিবন্ধকতাসমূহের বর্ণনাসহ জুম্ম ছাত্রদের বিভিন্ন শিক্ষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং সর্বোপরি তাদের জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি ও মুক্তি আন্দোলনে এম এন লারমার ভূমিকা অন্বেষণ করা হয়েছে।]

সূচনা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এবং নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলাদেশের অপরাপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২, ২০২২ : ১)। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে গঠিত এই পার্বত্য অঞ্চলে বৃহত্তর বাঙালি ছাড়াও এখানে ১৪টি সংখ্যালঘু জাতি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে (মনোজ বাহাদুর, ২০১৬ : ৭)। বাংলাদেশ সংবিধানে তাদেরকে 'উপজাতি' (বাংলাদেশ সংবিধান, পঞ্চদশ সংশোধন আইন, ২০১১) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যার অন্যতম কারণ হল সংখ্যাল্পতা ও বাঙালির কর্তৃত্ববাদী রাজনীতি। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এই অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনামলে এবং পাকিস্তান আমলে জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। পাশাপাশি সেখানে আধুনিক শিক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল অনেক পরে—যার অন্যতম কারণ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। এই শাসকগণ নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য চাইতো না যে সাধারণ প্রজারা

*সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস ও সভ্যতা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা ৯২০৮।

লেখাপড়া করে শিক্ষিত হোক। অথচ তারা নিজেরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিল (শরদিন্দু শেখর, ২০০২ : ১৫)। মূলত ১৮৬০ সালে এটি একটি স্বতন্ত্র অঞ্চলের মর্যাদা লাভ করেছে এবং বর্তমানে এখানে ২৬টি উপজেলা ও ৭টি পৌরসভা রয়েছে। এখানকার নদী, ঝর্না, পাহাড় ও বনাঞ্চল-ই অঞ্চলটিকে একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে (মন্ত্রণালয়ের পটভূমি, ২০২২) কিন্তু স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে গঠিত হলেও ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এখানে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ কোনও পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। তবে অল্পসংখ্যক প্রাতিষ্ঠানিক স্কুল গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসনামলে যা ছিল মূলত উচ্চ-শ্রেণি তথা রাজপরিবারের জন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্কুল হলো 'চন্দ্রঘোনা বোর্ডিং স্কুল'[১]; যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাঙ্গামাটিতে ১৮৬৩ সালে (W W Hunter, 1909 : 99)। হাচিনসনের মতে, তখন এই বোর্ডিং স্কুলে প্রায় ৫০ জনের মত আদিবাসী ছাত্র ছিল, যারা সেখানে থেকে পড়াশুনা করত এবং সরকার তাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিল (R. H. Sneyd Hutchinson, 1906 : 77)। কিন্তু সেসময় ছাত্রের অভাবে, যাতায়াতের অসুবিধা ও সচেতনতার অভাবে বান্দরবান ও মানিকছড়িতে প্রতিষ্ঠিত অন্য দুইটি বোর্ডিং স্কুল ১৮৭১ সালেই বন্ধ হয়ে যায় (মং শানু চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, ২০২০)। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের অল্পসংখ্যক শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ সেসময় তাদেরকে সচেতন করার কাজে উদ্যোগী ভূমিকা রেখেছিলেন যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, লারমার বাবা চিত্ত কিশোর লারমা এবং চাচা কৃষ্ণ কিশোর চাকমা। ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের স্বার্থের কথা না ভেবে এবং জনমত যাচাই না করেই রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করে যার সমাপ্তি হয় ১৯৬০ সালে। কিন্তু কাপ্তাই বাঁধের পরেও অনেক আদিবাসী বাবা-মা তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুব বেশি সচেতন ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা[২]জানান—

> তিনি যখন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছেন তখন অনেক আদিবাসী বাবা-মা তার বাবা-মাকে বলেছিলেন যে, তোমাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কী করবে? ওরা তো দূরে থাকবে, বাবা-মা'র খোঁজ নিবেনা বরঞ্চ আমাদের ছেলে-মেয়েরা আমাদের কাছে থাকবে, আমাদেরকে কাজ করে খাওয়াবে। (মথুরা বিকাশ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২০২০)।

কাপ্তাই বাঁধের কারণে মানুষের উপর সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব এবং তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সামন্ত নেতৃত্বের অপারগতার কারণে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তখন পাহাড়ি জনগণদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, শিক্ষালাভের বিকল্প নেই। মূলত ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের পর সবাই সচেতন হয়ে একসাথে শিক্ষা গ্রহণের যে চেতনা তা বৃদ্ধি পেয়েছিল; তারা ভেবেছিল যে, লেখাপড়া করতে হবে, কেননা তাদের আর পূর্বের মত করে থাকার অবস্থা নেই (মথুরা বিকাশ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২০২০)। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ধরনের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৪ সালের দিকে লারমার সাথে একত্রিত হয়ে অন্যান্য পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ অনেক অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন—যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই পাহাড়ি জনগোষ্ঠী যেন শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যেসকল ছাত্ররা কলেজে পড়াশুনা করত তারাও নিজ নিজ গ্রামের স্কুলগুলোতে তখন শিক্ষকতা করত, বাবা-মা'কে তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাতে উৎসাহ প্রদান করত। ফলে সকলের মধ্যেই তখন সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই ১৯৬৬ সালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষিতের হারও বৃদ্ধি পায় (আলীউর, ২০১৫ : ৩৭৩-৩৭৪)। পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বেই আদিবাসী ছাত্ররা ১৯৬৬ সালে ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনে বাঙালিদের সাথে একত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। আর এভাবেই তিনি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় বাংলাদেশের সকল পাহাড়িদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে অন্যতম ভূমিকা পালন করেন।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পার্বত্য চট্টগ্রামে এম এন লারমার রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়ে গবেষণা হয়েছে কিন্তু সেখানে তার উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিস্তার প্রসঙ্গে কোনও বিস্তারিত গবেষণা ইতোমধ্যে হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট আদিবাসীর সংখ্যা হল ১৬,৫০,১৫৯ জন, যার মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে বসবাস করছেন শতকরা ২.৯৯ ভাগ (Population and Housing Census Preliminary Report-2022 : 10)। আলোচ্যমান প্রবন্ধের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে শিক্ষাবিস্তার হয়েছিল এবং পাহাড়িদের মধ্যে পরবর্তীকালে শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল তা পর্যালোচনা করা। তবে বিশেষভাবে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ১৯৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে প্রবর্তিত হয়; কীভাবে এই শিক্ষার তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তার ঘটে; এক্ষেত্রে তার অগ্রণী ভূমিকা কী ছিল তা পর্যালোচনা করা।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় বিবরণ ও বিশ্লেষণ দুই-ই স্থান পেয়েছে। এখানে একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। মূলত এটি বর্ণনামূলক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হবে আর এই পদ্ধতিতে পূর্বজ্ঞাত কোন বিষয়কে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলা হয়। এই গবেষণার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এই গবেষণায় প্রাথমিক ও সহায়ক দুই ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত সংবিধান, জনশুমারি ও গৃহগণনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তথ্য, রিপোর্ট ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারসমূহ এবং কিছু কিছু সাক্ষাৎকার যা বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম, প্রবন্ধ, গ্রন্থ, বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও জার্নাল ইত্যাদি।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিচয়

রাঙ্গামাটি শহর থেকে কিছুটা দূরে মহাপুরম (মাওরুম) নামক একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যরাই ছিলেন সংস্কৃতিবান শিক্ষক। তার বাবা শ্রী চিত্ত কিশোর চাকমা, যিনি ছিলেন মহাপুরম জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি একাধারে ছিলেন মানবতাবাদী, সমাজসেবী ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার অধিকারী। তিনি চেয়েছিলেন সামন্তবাদে নিমজ্জিত ও পশ্চাৎপদ জুম্ম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে। মাতার নাম সুভাষিনী দেওয়ান, যিনি ছিলেন স্নেহময়ী ও ধর্মানুরাগী। তিনিও পড়াশুনা পছন্দ করতেন। তৎকালে তাদের বাড়িতে একাধিক ছাত্র সারাবছর থেকে খাওয়া-দাওয়া করে পড়াশুনা চালিয়েছে। ব্যক্তি জীবনে এম এন লারমা ছিলেন ভদ্র, নম্র, ক্ষমাশীল, সৎ ও নিষ্ঠাবান এবং মৃদুভাষী ব্যক্তি। তার স্মরণশক্তি ছিল অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তিনি সৃজনশীল মননের অধিকারী ছিলেন (জয়ীতা, ২০১৪ : ৩৫)। মূলত তিনি এবং তার ভাই-বোনেরা এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পরিবারের গুরুজনদের কাছ থেকে বাস্তব জীবনের শিক্ষা, সহিষ্ণুতা, রাজনৈতিকচেতনাসহ সংগঠন গড়ে তোলার শিক্ষাও অর্জন করেছিলেন। লারমার ছোট ভাই সন্তু লারমা শিক্ষাজীবনে মাতা-পিতার ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন—

> পিতা শুধু একজন শিক্ষকই নন। তিনি একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও একজন রাজনীতিবিদ, আর অন্যদিকে তিনি একজন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। [...] তিনি মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। (সজীব, ২০১৬ : ৪৭)

এম এন লারমা ছোটবেলা হতেই পড়াশুনা করতে বেশি পছন্দ করতেন। পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ প্রসঙ্গে তার বোন জ্যোতিপ্রভা লারমা জানান—

> স্কুলের পাঠ্যবইয়ের বাইরেও মঞ্জু গল্পের বই পড়তো সবসময়, এই অভ্যাসটা প্রথম শ্রেণি থেকেই ছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময়ে বাবা কলকাতা থেকে ডাকযোগে বিভিন্ন বই ও পত্রপত্রিকা এনে দিতেন। পত্রিকাগুলোর মধ্যে মাসিক *বসুমতি*, *শুকতারার* নাম মনে পড়ে। এসবই মঞ্জু গভীর আগ্রহ সহকারে পড়তো। বৃত্তির টাকা দিয়ে বই কিনত। প্রয়োজনে বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে সে নিজেই বই সংগ্রহ করত। এভাবে তার নিজের সংগ্রহেই অনেক বই পত্র ছিল। (জ্যোতিপ্রভা, ২০১৪ : ১০)

পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষাবিস্তারে এম এন লারমার অবদান

কর্ম ও পেশাগত জীবনে তিনি একাধারে ছিলেন শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। তবে শিক্ষক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল অনেক বেশি, কেননা তিনি খুব সহজে কঠিন বিষয়কে সহজ-সরলভাবে বোঝাতে পারতেন। এছাড়াও তিনি ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি তাদেরকে দেশপ্রেমের চেতনাকে জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এম এন লারমা সর্বদা ছাত্রদের সঙ্গে পাঠ্যবিষয়ের পাশাপাশি অন্যান্য গঠনমূলক আলোচনা করতেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। পাশাপাশি সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তবে তিনি যে বিষয়ে আলোচনা করতেন, আবার সপ্তাহ খানেক পর সে বিষয়ে তাদের থেকে জানতে চাইতেন। লারমা নিজে অনেক বই পড়তে ভালবাসতেন তাই তিনি তার ছাত্রদেরকেও বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে বলতেন। বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখতে বলতেন, যেন তারা বাস্তব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয় এবং সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়। তিনি একাধারে নিজ দেশের সংগ্রাম, আন্দোলন সম্পর্কে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি চীন, ভিয়েতনাম ও আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের সংগ্রাম ও আন্দোলন সম্পর্কেও বলতেন যেন তারা অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হয়। সেসময় পাহাড়ি ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এভাবেই তিনি ছাত্রদের কাছে প্রিয় মুখ হয়ে ওঠেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি এম এন লারমা ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তি; তাই তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ভালবাসা অর্জন করেছেন। ১৯৬৮ সালে তিনি যখন দিঘীনালা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তখন তিনি স্কুল হোস্টেলে থাকতেন। সে সময় স্কুলে আসার পথে নদী পারাপারের জন্য একটি ব্রিজ নির্মাণাধীন ছিল যেটিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল বাঙালিরা। তখন নদী পারাপারের জন্য কেবল একটি ডাইভারসন ছিল; ফলে ছাত্ররা যখন ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পার হয়ে স্কুলে আসছিল তখন বাঙালি শ্রমিকরা প্রায় ৪০ জন ছাত্রকে আটক করে থানায় খবর দেয়। কিন্তু যখন লারমা এই সংবাদ পান তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের উদ্ধারের জন্য চলে যান এবং তাদেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। এভাবে তিনি তার ছাত্রদের আপন করে নিয়েছিলেন (মেসবাহ, ২০১৫ : ৪৫৬-৪৫৭)। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষাবিস্তারের পাশাপশি জুম্মজাতি নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য সচেতন হবে। আর এভাবেই আদিবাসীরা একত্রিত হয়ে শাসকদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলবে জন-আন্দোলন। শিক্ষাক্ষেত্রে এম এন লারমার ভূমিকা প্রসঙ্গে তেজদীপ্ত চাকমা অজিত তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—

> জুম্ম সমাজের মধ্যে এম এন লারমা প্রথম অনুধাবন করেছিলেন শিক্ষাবিস্তার ছাড়া ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে অধিকার সচেতন করা যাবে না। তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে এক নতুন মাত্রায় শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি তৎকালীন ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করেন এবং তাদের জুম্ম সমাজের মধ্যে শিক্ষাসচেতনতা ও শিক্ষাপ্রসারে উদ্বুদ্ধ করেন; তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং শিক্ষার প্রচারাভিজানে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শিক্ষকতার মূল

> উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকতার আড়ালে অধিকার হারা জুম্ম জনগণকে অধিকার সচেতন করা ও তাদের সুসংগঠিত করা। তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন শিক্ষিত মানুষ অতি সহজে তার অধিকারগুলো চিনতে এবং নির্যাতন-নিপীড়ন, শোষণ-শাসনের ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সঠিক পথ ও মত খুঁজতে পারে। (তেজদীপ্ত, ২০১৪ : ৩৩)

তিনি এম এন লারমা প্রসঙ্গে আরও বলেন—

> তিনি (লারমা) প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে জাগ্রত করতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প হতে পারেনা। পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর ভূমিকা অগ্রগামী। (তেজদীপ্ত, ২০১৪ : ৩৩)

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদেরকে সচেতনতার শিক্ষাও দিতেন। তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে তাদের চেতনাকে যেন জাগ্রত করে তোলা যায়, তার শিক্ষাও তিনি দিতেন। এই প্রসঙ্গে বিজয় কেতন চাকমা বলেন—

> মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি আমাদেরকে জীবনের সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। [...] তিনি বলতেন রাজনৈতিক অধিকার ব্যতীত কোন অধিকারই টিকে থাকতে পারেনা। তাই প্রথমেই জনগণকে রাজনৈতিকভাবে অধিকার সচেতন করে তুলতে হবে। অন্য কিছু দ্বারা মানুষের নিকট হতে অতি সহজেই সস্তা বাহবা পেতে পারে; কিন্তু এর দ্বারা মানুষের তেমন উপকার হবে না। (বিজয় কেতন, ২০০২ : ১৫-১৬)

পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষাবিস্তারে এম এন লারমার ভূমিকা প্রসঙ্গে মোনঘরের অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার মহাথের বলেন—

> এম. এন. লারমা মূলত তার জ্যাঠা কৃষ্ণ কিশোর চাকমার কাছ থেকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনিও তার জ্যাঠার মত শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি সর্বদা শিক্ষার্থীদের অধিকার, দাবি নিয়ে সোচ্চার ছিলেন, আন্দোলন করেছেন। তাই দেখা যায় যে, তার যখন বি. এ পরীক্ষা পাশের ফলাফল পান তখন তিনি ছিলেন জেলখানাতে। মূলত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাহাড়িরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনুন্নত, তাই তিনি তাদের সচেতন হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তার শিক্ষার্থীদের সর্বদা বলতেন যে, তোমরা পড়াশুনা কর এবং এর পাশাপাশি বাস্তব শিক্ষা তথা দৈনন্দিন শিক্ষা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হবে, যেটা দিয়ে তোমাদের জীবন চলবে। এর পাশাপাশি তিনি যখন পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ও তিনি সর্বদা পাহাড়িরা যেন সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে এবং তাদের সকল ন্যায্য দাবি-দাওয়ার কথা তুলে ধরেছিলেন। (শ্রদ্ধালংকার, ২০২০)

এম এন লারমা অনেক বড় মনের অধিকারী ছিলেন। তার যে অর্জিত জ্ঞান ছিল তা সকলের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। যা জানতেন তা সবাইকে বলতেন। ১৯৬৫ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। শিক্ষা সংক্রান্ত তার কিছু স্লোগান ছিল যা এখনও জনপ্রিয়। যথা : 'গ্রামে ছড়িয়ে পড়', 'শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো', 'সকল জাতির অধিকার সমান' প্রভৃতি যা এখনও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক (পঙ্কজ, ২০১৬ : ১৪০-১৪২)। আদিবাসীদের শিক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন যে, ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ, পরিবর্তিত হওয়ার গুণ—এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না। (জুলিয়ান, ২০২০)

পাহাড়ি ছাত্রসমিতি প্রতিষ্ঠা ও জুম্মজাতির মধ্যে আধুনিক শিক্ষার সূচনা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সারাটা জীবন ছিলেন বিপ্লবী ও প্রতিবাদী। জাতিতে আদিবাসী হলেও তার চিন্তা-চেতনা ছিল দেশের সকল অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জন্য। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন শাসনব্যবস্থা ছিল সমান্ততান্ত্রিক এবং সমাজ ছিল পশ্চাৎপদ। কিন্তু তার পরিবার-পরিজনেরা সর্বদাই অভিজাত শ্রেণি কর্তৃক প্রজাশ্রেণির ওপর যে শোষণ তার প্রতিবাদ করেছেন। তার জ্যাঠা কৃষ্ণ কিশোর চাকমা একাধারে ছিলেন শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক। তিনি স্কুল ইন্সপেক্টর থাকাকালে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে। তিনি মূলত আদিবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশে শিক্ষার প্রসার করেছিলেন। তাই লক্ষ্য করা যায় যে, তার পরিবারের প্রায় সকলেই এই সামন্ত নেতৃত্বের বিরোধী ছিলেন এবং যারা রক্ষণশীল ও প্রগতিবিরোধী তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তারা জুম্মবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জুম্ম সমাজে আধুনিক শিক্ষার সূচনা করেছিলেন (মঙ্গল, ২০১৬ : ২১)।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বিপ্লবী রাজনীতির সাথে জড়িত হয়েছিলেন, কেননা তিনি স্কুল জীবনেই গভীরভাবে দেখেছেন যে, শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নির্মম অত্যাচার, জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে এই জুম্ম আদিবাসীরা। সুদূর অতীত থেকেই এই আদিবাসীরা শোষিত হয়ে আসছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে তারা ব্রিটিশ কর্তৃক শোষিত হয়েছে, '৪৭ পরবর্তীকালে পাকিস্তান শাসক কর্তৃক নির্মিত কাপ্তাই বাঁধের ফলে লক্ষাধিক আদিবাসী উদ্বাস্তু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এম এন লারমা ষাটের দশকে ছাত্রদের একত্রিত করে প্রথমে রাজনৈতিকভাবে তাদের সংগঠিত করেন। তিনি ছাত্রদের পাশাপাশি যুবসমাজকেও একত্র করেন। ফলে বলা হয় যে, ষাট এবং সত্তর এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। তখন সর্বত্রই এক ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আন্দোলন লক্ষ করা যায়। (মঙ্গল, ২০১৬ : ২১-২২)

প্রথমদিকে ১৯১৫ সালে পাহাড়ি ছাত্রসমাজ কর্তৃক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু স্থায়ী বেশিদিন হয়নি। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দমনের কারণে এটি ১৯৩০ সালেই বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে ছাত্রদের নিয়ে ১৯৪৫ সালে আবারও আন্দোলনের সূচনা করেন। এটিও কেবল ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। মূলত তখন সামন্ততান্ত্রিক শাসক ও পাকিস্তানি প্রশাসন একত্রিত হয়ে আদিবাসীদের শোষণ করছিল। ফলে আদিবাসীদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পাহাড়ি ছাত্ররা—যারা নিজেরা সচেতন হয়ে 'স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য জেগে উঠা দরকার'—এই চেতনা নিয়ে পুনর্গঠিত করেছিল 'পাহাড়ী ছাত্র সমিতি'। এটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল জুম্ম আদিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়সহ সকল ধরনের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করা (মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯২)। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৫৬ সালে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে এই পাহাড়ি ছাত্রসমিতিতে যোগদান করেছিলেন এবং পরবর্তী বছর ১৯৫৭ সালে সংগঠনটির বিভিন্ন কার্যক্রমে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন শুরু হলে এর কার্যক্রম পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৬০ সালের দিকে পাহাড়ি ছাত্রসমিতির কার্যক্রম তিনি নূতনভাবে শুরু করেন। তার নেতৃত্বে ছাত্রসমিতির সদস্যদের মাধ্যমে তখন ভিন্ন ভিন্ন আদিবাসী জাতিসমূহ—যারা শাসকগোষ্ঠীর দমন, নিপীড়নের কারণে অবলুপ্তির পথে যাচ্ছিল—তারা সকলে একত্রিত হয়। তাদের মাধ্যমেই তখন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রথম ও একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন সূচিত হয়েছিল। (মঙ্গল, ২০১৬ : ৫)

কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি

১৯৬০ সালে যখন পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে তখন এম এন লারমা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই বাঁধ নির্মাণের যে লক্ষ্য ও নীতি তা ছিল মূলত আদিবাসীদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। তাই তিনি তখন এর বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হন। যখন কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হয় তখন এম এন লারমার প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন—

> ১৯৬০ সালে এই মরণফাঁদ প্রকল্প চালু হয়। এ ঘটনাটি মারাত্মকভাবে নাড়া দেয় এম এন লারমার জীবনকে, এটি হয়ে উঠে তাঁর জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট। এ সময়ে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তাঁকে তাড়া করে ফিরতে থাকে এক মহাবিপদের চিন্তা। জুম্ম জনগোষ্ঠীর শিকড় ছিন্ন এবং অস্তিত্ব বিপন্ন করা এবং জুম্ম সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিলুপ্ত করার এক 'রাষ্ট্রীয়' ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পাহাড়ি জনগণসহ দেশের আপামর জনগণকে সচেতন, সক্রিয় ও সংগঠিত করার কঠিন কর্মপন্থা তিনি গ্রহণ করেন। (পঙ্কজ, ২০১৬ : ১৩৯)

কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে লারমা তৎকালীন স্বনামধন্য পত্রিকা 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'দৈনিক সংবাদ'-এর চিঠিপত্র কলামে প্রবন্ধ লিখেন। এছাড়া কলকাতার 'The Statesman' পত্রিকাতেও তার এই বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। যেখানে বলা হয় যে, কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প হলো পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার প্রকল্প (পঙ্কজ, ২০১৬ : ১৩৯)। এম এন লারমা মনে করতেন—এই কাপ্তাই প্রকল্প হলো পাহাড়িদের অস্তিত্বকে বিলোপ সাধনের জন্য একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং তাদের জনগোষ্ঠীকে নিঃস্ব করার একটি প্রকল্প যাকে তিনি পাহাড়িদের 'চিরন্তন কান্না' বলে অভিহিত করেন। মূলত তখন এই কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে সামন্ত নেতারা প্রতিবাদ করেনি এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বরং তারা পাকিস্তানি সরকারের কর্মকাণ্ডকে প্রশংসা করে। কিন্তু এসময় এম এন লারমা জনগণকে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন—

> একদিকে পাক শাসকগোষ্ঠী এবং অন্যদিকে সামন্তপ্রভুদের পাহাড়ি জাতি বিনাশী এ সকল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে অভিন্ন জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আদর্শ নির্মাণের কাজে, জুম্ম যুব শক্তিকে জাতীয় অগ্রণী বাহিনী হিসেবে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষায় অগ্রসর করার কাজে, সকল শোষণ-নির্যাতন, অশিক্ষা কুসংস্কার থেকে মুক্তির সামাজিক আন্দোলন গড়তে 'গ্রামে চলো' স্লোগান নিয়ে গ্রামঞ্চলে 'জাতীয় শিক্ষায়' স্বদেশি আন্দোলন গড়ে তোলা এবং যুব বাহিনীকে সর্ব পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং শিক্ষা বিস্তার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এম এন লারমা। (পঙ্কজ, ২০১৬ : ১৩৯)

এম এন লারমা ১৯৬২ সালে এই বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে একটি লিফলেট প্রচার করে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জায়গায় পৌঁছে দেন। এই লিফলেটটি তখন জনগণের মধ্যে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফলে তৎকালীন সরকার ১৯৬৩ সালে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে কারাগারে প্রেরণ করেছিল। ১৯৬৫ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন (ঘোষণাপত্র, ২০১৪ : ৫)। কাপ্তাই বাঁধের কারণে এম এন লারমার যে শিক্ষা আন্দোলন সেটা সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল; পরবর্তীকালে যেটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। সেসময় শিক্ষা আন্দোলন প্রসঙ্গে রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মোনঘর'-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কীর্তি নিশান চাকমা বলেন—

> ৬০ সালের পর শিক্ষা চেতনা তৃণমূল পর্যায়ে চলে যায়। কারণ এসময় কাপ্তাই বাঁধকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অনেক প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এসময় পূর্বের যে পুঁথিসাহিত্য ছিল সেটা থেকে বের হয়ে অনেক আধুনিক সাহিত্য, কবিতা, নাচ, গান ও নাটক রচিত হয়। এছাড়া এসময় শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনেক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন

> বলা হয়েছিল যে, আগে স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করতে হবে তারপর ধর্মীয় চর্চা করতে হবে। (কীর্তি নিশান, ২০২০)

এম এন লারমার নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন ও কার্যক্রম

ছাত্রাবস্থায় এম এন লারমা ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ১৯৫৬ সালে এস এস সি পরীক্ষার সময় তিনি যে হোস্টেলে থাকতেন সেখানে পরীক্ষার্থীরা যেন তাদের সুবিধা অনুযায়ী আহারের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে পারে, সেজন্য তিনি সহপাঠীদের নিয়ে অনশন ও ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। অবশেষে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মেনে নিয়েছিল। এছাড়াও ১৯৫৭ সালে তারই নেতৃত্বে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা 'পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলন'-এ অংশগ্রহণ করেছিল। পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা নির্মিত ১৯৬০ সালের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ছাত্র সমিতির আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে। এছাড়া ১৯৬৩ সালের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে শাসনতান্ত্রিক সংশোধন এবং পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমাদের অনুপ্রবেশের পাশাপাশি প্রায় ষাট হাজার পাহাড়ি আদিবাসী দেশান্তরিত হয়। এভাবে ৬০-এর দশকে প্রায় পুরোটা সময়েই আদিবাসীদের ক্রান্তিকালীন অবস্থায় ছাত্ররা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায় এম এন লারমার নেতৃত্বে (জিমি, ১৯৮৪ : ২৩-২৪)।

১৯৬২ সালে যে ঐতিহাসিক পাহাড়ি সম্মেলন হয়েছিল সেখানেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৬২ সালের এই সম্মেলনে উপস্থিত কর্মীরা এম এন লারমার নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা তখন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রদের সংগঠিত করার জন্য তাদের সাথে আলোচনা করত। পাশাপাশি তারা তখন গ্রামের সাধারণ জনগণকেও সংগঠিত করার কাজ করত। এ সময় ছাত্ররা সামন্ত নেতাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। ফলে তখন সমিতির কর্মীরা নানা ধরনের কৌশল গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়; যেমন—তারা এলাকায় গিয়ে যে সকল মুরুব্বি ও হেডম্যান রয়েছে তাদের পায়ে ধরে সালাম করত। কখনও কখনও তারা নানা বিষয়ে গল্প করত। তবে বয়স্করা অনেক তর্ক করত ছাত্রদের সাথে কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তারা ছাত্রদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমত হয়েছিল। আর এভাবেই তখন এম এন লারমার নেতৃত্বে তাদের সংগঠন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন ছাত্ররা। (পঙ্কজ, ২০১৬ : ১৪০, আরও দেখুন, সজীব চাকমা, ২০১৬ : ৫২ এবং মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯৩)।

ঐতিহাসিক ছয় দফা : পাহাড়ি ছাত্রদের অংশগ্রহণ

১৯৬৬ সালে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা দাবিকে শুধু বাঙালি জাতিই নয় পাহাড়িরাও সমর্থন জানিয়েছিল। যদিও এই ৬ দফা দাবিতে কোথাও পাহাড়িদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কোনও আলোকপাত ছিল না। তবুও তারা ভেবেছিল যে, এর মাধ্যমে দীর্ঘদিনের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগণ কর্তৃক চালিত শোষণ ও নিপীড়ন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা যেমন তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে; তেমনি আদিবাসীদেও দীর্ঘ লালিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। তাই পাহাড়ি ছাত্ররা তখন এম এন লারমা ও তার ছোট ভাই সন্তু লারমার নেতৃত্বে এই ছয় দফা আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন—

> গোটা পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন প্রগতিশীল ব্যক্তিরা। এই আন্দোলনের অবদান হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ এবং বাঙালিকে একটা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এটাতো এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলন; ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিপরীতে এ আন্দোলন। এদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক নেতৃত্বই এই আন্দোলনের পরিবেশটা সৃষ্টি করেছিল। এই আন্দোলন শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে হয়েছে এটা বলা উচিত না। কারণ আওয়ামী লীগ এককালে ছিল একটা সাম্প্রদায়িক দল। আওয়ামী মুসলিম

লীগ একটা পর্যায়ে এসে আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে। শেখ মুজিব ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। তিনি প্রথম থেকে মুসলিম লীগে জড়িত ছিলেন। সুতরাং আওয়ামী লীগের দৃষ্টিতে যে জাতীয়তাবাদ, আর গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলন বা নেতৃত্বের যে জাতীয়তাবাদ তার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। এদেশের প্রগতিশীল যে আন্দোলন অর্থাৎ বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রাম বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব যেটা বামপন্থীরা শুরু করেছিলেন। তবে আন্দোলনের নেতৃত্বে থেকে একপর্যায়ে তাঁরা সরে যেতে বাধ্য হন। যে কারণে হয়তো পাহাড়িদের মত সংখ্যাল্প জাতিসমূহের অধিকারটা সেখানে স্থান পায়নি। অথচ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পাহাড়িদের অধিকারের ঘোষণা থাকার কথা ছিল। কারণ নেতৃত্ব যদি বাম প্রগতিশীল হয় তাহলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এদেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকার লিপিবদ্ধ থাকবে না কেন? এ কারণে যতদূর জানা যায় ১৯৬৬ সালে পাহাড়ে আদিবাসীদের মধ্যে ৬ দফা আন্দোলন তেমন ব্যাপক কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নাই। ঐ সময়ে পাহাড়িরা নিজেদের সংগঠিত হওয়ার আন্দোলনটাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। (মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯৮)।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান : পাহাড়ি ছাত্রদের অংশগ্রহণ

১৯৬৯ সালে সারা দেশব্যাপী যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল এর প্রভাব তখন পার্বত্য চট্টগ্রামেও পড়েছিল যদিও এটি সমতল অঞ্চল হতে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্রসহ সাধারণ জনগণও এই আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মসচেতন হয়েছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। ফলে পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যায় ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালের এই গণ-আন্দোলনের সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি'। এটি মূলত গঠন করেছিল রাঙ্গামাটি কলেজের বাঙালি ও পাহাড়ি ছাত্ররা একত্রিত হয়ে এবং আহ্বায়ক ছিলেন অশোক মিত্র কারবারী। এই কমিটির উদ্যোগে তখন ছাত্ররা রাঙ্গামাটিতে মিছিল করে। সেটা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয় বিষয় কেননা সেসময় মিটিং-মিছিলকে বলা হতো রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ। আর এই ধরনের কাজ করলেই থানায় ধরে নিয়ে যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখন ছাত্ররা একত্রিত হয়ে সারা দেশব্যাপী পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে মিছিল করে। যদিও পাহাড়ি ছাত্র সমিতির মূল নেতৃত্বে ছিলেন এম এন লারমা কিন্তু এসময় মূলভূমিকা পালন করেছিলেন সন্তু লারমা (মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯৯)। এ প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন—

বর্তমানে যেমন সমতলের রাজনীতির সাথে পাহাড়িরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত পূর্বে তেমন ছিল না। যেমন আমি ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। তবে এর শাখা পার্বত্য অঞ্চলে নেইনি। পাহাড়ে এসে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি করতাম। এর কারণ ছিল বাস্তবতার আলোকে নিজেদেরকে সংগঠিত করে দেশের বৃহত্তর পরিধিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথেও যুক্ত থাকা। তবে এম এন লারমা ১৯৬৮ সালে শিক্ষকতার কাজে চট্টগ্রাম আসেন। রেলওয়ে স্টেশনের কাছের এলাকাটা ছিল বিহারী বাঙালি রেল কর্মচারীদের। তিনি তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রমিক ফেডারেশনের সাথে যুক্ত থেকে। এ সময় তিনি চট্টগ্রামের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন, নিয়মিত সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত করেছেন। ৬৯–এর গণঅভ্যুত্থানে এম এন লারমার নেতৃত্বে শ্রমিকরা ব্যাপক সংখ্যায় অংশ নিয়েছিল। পাহাড়ি ছাত্র যুবকরা এ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করেছিল। এর বিরুদ্ধে পার্বত্য আদিবাসীদের সমর্থন ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির টানাপোড়েনে পাহাড়িরাও আন্দোলিত ছিল নানা ভাবে। একদিকে ন্যাপ, প্রগতিশীল দল, অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সাথে বিচ্ছিন্নভাবে কথাবার্তা চলছিল এম এন লারমার। (মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯৯)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে তখন পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কর্মীরা ১৯৬৯-এর যে ১১ দফা দাবি ছিল সেগুলো সম্পর্কে জানিয়েছিল, যেন সকলে তৎকালীন আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারে। সেসময় মূল ভূমিকা রেখেছিলেন রাঙ্গামাটি কলেজের শিক্ষক মং শানু চৌধুরী ও

মটুলাল চাকমা। তাদের নেতৃত্বে তখন ছাত্রদের এই আন্দোলন আরও বেশি বেগবান হয়েছিল। পূর্বে যে রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোচনা ও চিন্তা-চেতনা কেবল ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো কিন্তু '৬৯ এর এই গণআন্দোলন তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সকল স্কুল, কলেজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রথম তারা বুঝতে পারে যে তারা চাইলে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে, তাদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে বলতে পারবে। ফলে তখন ছাত্রদের মধ্যে অনেক বেশি সচেতনতা ও উৎসাহ কাজ করেছিল এই গণঅভ্যুত্থান দ্বারা (মেসবাহ, ২০১৫ : ২০০)। এভাবে তখন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে একটি প্রভাব বিস্তার করেছিল। বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে প্রায় সকল পাহাড়ি ছাত্রসহ সাধারণ জনগণ এই গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল।

শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

এম এন লারমা শিক্ষকদেরকেও শিক্ষাবিষয়ে সচেতন হতে বলেছিলেন এবং শিক্ষকতায় যোগদান করতে বলেছিলেন। অংজয় মারমা ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তিনি একদিন লারমার বাড়িতে গিয়েছিলেন তার আহ্বানে, বাসায় গিয়ে দেখেছিলেন লারমা খুব সাধারণ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, লারমা খুব সহজ-সরলভাবে জীবনযাপন করতেন। তার বসবাসের জায়গাটি ছিল সাধারণ একটি ঘর যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আলাপচারিতায় লারমা তাকে পাহাড়ি আদিবাসীদের যে বঞ্চনা-দুঃখ-দারিদ্র তা বলেন এবং জাতীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য শিক্ষকসমাজকে এগিয়ে আসতে বলেন (অংজয়, ২০১৬ : ৭৯-৮০)। এছাড়াও তিনি শিক্ষকদের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে চলা নির্যাতন, শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী হয়ে ওঠার জন্য মন্ত্র পাঠাতেন। এ প্রসঙ্গে অংজয় মারমা বলেন যে—

> কোন এক সময় তাঁর সাথে আমার একবার বান্দরবান সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি বলেছিলেন, মাস্টারবাবু, যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্বের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। (অংজয়, ২০১৬ : ৮০)

বিজয় কেতন চাকমা ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট শিজকমুখ জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পূর্বে তিনি তার নিজের জমিতে চাষাবাদ করতেন। চাকরি করতে তার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু এম এন লারমার জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানার আগ্রহে তিনি শিক্ষকতায় এসেছিলেন কেননা তিনি জানতেন লারমা তার জীবনের প্রথমদিকে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন, তার পিতাও গুণী শিক্ষক এবং তার জ্যাঠা কৃষ্ণকিশোরও পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষাবিস্তারে অনেক ভূমিকা রেখেছেন। এম এন লারমা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে—

> মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন সত্যিকার অর্থে আমাদের জন্য একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি আমাদেরকে জীবনের সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। বলাবাহুল্য, মাত্র কিছুদিনের জন্য হলেও তাঁর জীবনাদর্শের শিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরে আমি অনেক লাভবান হয়েছি। এই সময়ে আমার কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ছাত্র-ছাত্রীকে দেখলে এবং তাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ মধুর ব্যবহার সত্যিই আমার জন্য গৌরবের। (বিজয় কেতন, ২০০২ : ৪৪)

সহকর্মীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার

ছাত্রদের পাশাপাশি এম এন লারমা পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কর্মীদের শিক্ষার ব্যাপারে অনেক চিন্তা করতেন। তাই তিনি কর্মীদের সর্বদাই দেশ এবং দেশের বাইরের নানা ধরনের বই পড়তে বলতেন যেন তারা বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হতে পারে। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, সমাজ-তত্ত্ব, দর্শন, প্রাণী জগতের বিকাশ, সমাজের বিকাশ, অর্থনীতির বিকাশ, অনুবাদ সাহিত্যসহ ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট বই পড়তে উৎসাহিত করতেন নিজ কর্মীদের। পাকিস্তান আমলে সমাজতন্ত্র বিষয়ক বই ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোপনে ছাত্র সমিতির কর্মীরা বিভিন্ন সাম্যবাদী মতাদর্শের বই সংগ্রহ করে পড়ত। এই বইগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল

মার্কসবাদ-লেলিনবাদ সংশ্লিষ্ট বই, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পত্রিকা *হক কথা* এবং বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বই যেমন—*আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম*, *আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম*, *চীনের আকাশে লাল তারা*, *দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন*, *রুশ বিপ্লব*, *চীন বিপ্লব*, *ভিয়েতনামের যুদ্ধ*, *ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম* প্রভৃতি (মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯৪)। এভাবে তিনি তার কর্মীদের ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে তুলেছিলেন এবং এদের নিয়ে একত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন করেছিলেন। ছাত্র সমিতির কর্মীদের পাশাপাশি তিনি তার জনসংহতি সমিতির সদস্যদের শিক্ষার ব্যাপারে অনেক উৎসাহ দিতেন। এ প্রসঙ্গে রেণী তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—

> জনসংহতি সমিতির সার্বক্ষণিক কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর অথবা স্বল্প শিক্ষিত। তিনি এদেরকে নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাই তিনি দলীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এসব নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত সহকর্মীদের জন্য পার্টিতে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেন। এমনকি হাজারো কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সহকর্মীদের লেখাপড়া শেখাতেন। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি রাজনীতির ক্লাসও পরিচালনা করতেন। তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অনেক কর্মী বিভিন্ন স্থানে আজও দলীয় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। (রেনী, ২০১৬ : ৭৬)

নতুন নেতৃত্ব তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি

১৯৭০ সালে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কর্মীদের উদ্যোগে তিন পার্বত্য জেলায় ছাত্র সমিতির শাখা বিস্তারের কাজ আরও বৃদ্ধি পায়। তবে এতে মূল ভূমিকা রেখেছিল সন্তু লারমা, গৌতম কুমার চাকমা ও রূপায়ন দেওয়ান প্রমুখ। তখন খুব গোপনে কাজ করতে হতো। সমিতির সদস্যদের চাঁদার অর্থে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ছাত্রদের পাশাপাশি তখন স্কুলের শিক্ষকরাও শাখা বিস্তারের জন্য সাহায্য করেছিল। যেমন : পানছড়ি, মাইজছড়ি, কাচালঙ্গ, দিঘীনালা হাইস্কুলের শিক্ষকরা নিজেদের ইচ্ছাতেই সেসকল স্কুলে শাখা খুলতে রাজী হয়েছিল। তখন রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের সকল পাহাড়ি ছাত্র সমিতির সদস্যরা লারমার নেতৃত্বে একত্র হয়ে সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নূতন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তবে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কর্মীরা তাদের এই আন্দোলনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল শিক্ষাকে। তারা চেয়েছিল একসাথে শিক্ষাবিস্তারের পাশাপশি গ্রামের সাধারণ জনগণ ও ছাত্রদের কাছাকাছি তারা পৌঁছতে পারবে। কেননা শিক্ষা ছাড়া সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রায় অসম্ভব। তাই তারা প্রথমেই বিভিন্ন এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিল। আর এই স্কুলকে কেন্দ্র করে গ্রামের সকল জনগণ তাদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাবে এবং তারাও স্কুলে এসে শিক্ষকেদের সাথে মিশবে, আলোচনা করবে আর এতে করে ছাত্র সমিতির কর্মীরা তাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে কর্মীদের গ্রহণযোগ্যতাও বাড়বে এবং এ সকল জনগণ তাদের নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে (মেসবাহ, ২০১৫ : ১৯৫)। তাদের ধারণা ছিল যে, যদিও গ্রামে প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী মানুষ ছিল খুব কম কিন্তু যদি তাদেরকে শিক্ষা দ্বারা সচেতন করে একত্র করা যায় তবে কেবল দেশে পাকিস্তানি প্রশাসকদের বিরুদ্ধেই নয় বরঞ্চ সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও তাদের লড়াইটা চালিয়ে নিতে পারবে। কেননা তারা পরস্পরের সাথে আঁতাত করেছিল এবং জুম্ম সাধারণ জনগণকে দিনের পর দিন শোষণ ও নিপীড়ন করে আসছিল। তাই এই আন্দোলনের মাধ্যমেই তখন নূতন নূতন নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চিন্তা-চেতনা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি

এম এন লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কর্মীরা নিজেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ জনগণকেও সচেতন করেছিল। পাশাপাশি তারা তখন সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও আন্দোলনরত ছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তৎকালীন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত

সতর্কতার সাথে পাহাড়ি ছাড়াও সমতলের নেতাদের সাথে আলোচনা ও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি বাস্তবতার আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চিন্তা-চেতনা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিজেদেরকেই আদায় করে নিতে হবে। অর্থাৎ তারা-ই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে। তাই লক্ষ করা যায় যে, এম এন লারমার নেতৃত্বেই তখন এই আদিবাসীদের আন্দোলন প্রায় পুরো চট্টগ্রামেই বিস্তার লাভ করেছিল (মেসবাহ, ২০১৫ : ২০৪)। সকল শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার প্রসঙ্গে ১৯৫৭ সালের Indigenous and Tribal Population-এর ১০৭নং ধারাতে বলা হয়েছে :

> (চ) অনুচ্ছেদ ২১-এ শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, Measures shall be taken to ensure that members of the populations concerned have the opportunity to acquire education at all levels on an equal footing with the rest of the national community. (Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957)
>
> (ছ) অনুচ্ছেদ ২৩-এর উপ-অনুচ্ছেদ ১-এ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, Children belonging to the population concerned shall be taught to read and write in their mother tongue or, where this is not practicable, in the language most commonly used by the group to which they belong. (Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957)

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ১১টি ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের শিক্ষা ও মাতৃভাষা সম্পর্কে কোনও শাসনব্যবস্থায়ই কোনও ধরনের উন্নয়ন ও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। তখন শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ আদিবাসীদেও কোনও অধিকার ছিলনা। পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিবারের নেতৃত্বে শিক্ষাবিস্তার হয়েছিল। এম এন লারমা যখন জাতীয় সংসদ সদস্য হন তখন তিনি পার্বত্য অঞ্চলের জন্য নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য জাতীয় পর্যায়ে চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছেও স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন (মঙ্গল কুমার, ২০১৬ : ১৫)। তার স্বপ্ন ছিল—

> দেশের সংবিধান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং সকল প্রকারের জাতিগত-শ্রেণিগত নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটাবে। তাঁর বুকভরা আশা ছিল, সংবিধানে জাতি-শ্রেণি নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং ঔপনিবেশিক অপশাসনের সকল কালাকানুন ও নিপীড়নের চিরঅবসান হবে। (মঙ্গল কুমার, ২০১৬ : ১৬)

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ভিন্ন ভাষার আদিবাসীদের শিক্ষার উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের ভাষার উন্নয়নের জন্য জাতীয় সংসদে তৎকালীন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি ও ক্রীড়া (শিক্ষা বিভাগ) মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তার প্রস্তাব শেষ করেন। তিনি জানতে চান—

> ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের দশটি পৃথক ভাষাভাষি চাকমা, মারমা (মগ), ত্রিপুরা, লুসাই, বম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরং ও চাকদের ভাষা উন্নয়নের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা; এবং
>
> খ. প্রশ্নে উল্লিখিত দশটি ভাষা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা; করিয়া থাকিলে, কবে হইতে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তায়িত হইবে; না হইলে, উহার কারণ কি? (পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাষার উন্নয়ন', খণ্ড-২, ১৯৭৪ : ২৯২)

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান (পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাষার উন্নয়ন', খণ্ড-২, ১৯৭৪ : ২৯২)—

ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম-এ প্রচলিত ১০টি ভাষা উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা আপাতত নাই।
খ. পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হেতু দেশের অন্যান্য অংশের সহিত ইহার সম্পর্ক নিবিড় হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয় এবং একমাত্র বাংলা ভাষার মাধ্যমেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। এই জন্য প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য জেলার মত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বাংলা ভাষায় শিক্ষা দান করা হইতেছে।

এম এন লারমা আরও কিছু বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন—

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কি না; হইলে উহার সংখ্যা কত এবং ঐগুলির নাম কি;
খ. উক্ত উচ্চ বিদ্যালয়গুলির কোনটার উন্নয়নের কাজ অর্ধসমাপ্ত হইয়া রহিয়াছে কিনা; থাকিলে উক্ত বিদ্যালয়গুলির নাম কি; এবং
গ. খ-উল্লিখিত বিদ্যালয়সমূহের কাজ সমাপ্ত করিয়া দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; থাকিলে, কবে করা হইবে, না থাকিলে, উহার কারণ কি? (পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাষার উন্নয়ন', খণ্ড-২, ১৯৭৪ : ২৯২)

এছাড়াও তিনি সংসদে দেশে কতটি সংস্কৃত ও পালি টোল এবং চতুষ্পাঠী কলেজ আছে তার নির্দিষ্ট সংখ্যা জানতে চান এবং সেসকল শিক্ষকগণ কোন সরকার কর্তৃক শিক্ষক কল্যাণ ভাতা পান কি না এবং সেটা কি পরিমাণ, তা তিনি জানার জন্য প্রস্তাব করেন। পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কোনও প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না জানতে চান। কিন্তু এই বিষয়ে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী উত্তরে বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন করা হবে কিন্তু এখনও অবধি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি (পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাষার উন্নয়ন', খণ্ড-২, ১৯৭৪ : ২৯৩)। এভাবে তখন সংবিধানে আদিবাসীদের মাতৃভাষাকে কোনপ্রকার উন্নয়ন না করে বরঞ্চ পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা হয়। আর এর বিরুদ্ধে তখন এম এন লারমা প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু সংবিধানে আদিবাসীদের এই ভাষাকে কোন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এছাড়া লারমা ১৯৭২ সালে সংবিধানে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সংশোধনী দিয়েছিলেন। তিনি তার প্রস্তাবে বলেন—

১৭ অনুচ্ছেদের ৩য় পঙক্তিতে অবস্থিত 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত' শব্দাবলীর পরিবর্তে 'শিক্ষার বিভিন্ন দিকে মেধা ও প্রবণতা অনুসারে' শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক। (মঙ্গল কুমার, ২০১৬ : ১৯৫)

তিনি বলেন—

আমি এই সংশোধনী এনেছি তার কারণ, এই শিক্ষা সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য আছে। শিক্ষা যদি শুধু আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত হয়, তাহলে যে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে দেশের কর্ণধার হবে, মেধা-অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগের অভাবে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটবে না। সেই মেধা ও প্রবণতা বিভিন্ন জনের বিভিন্নভাবে পরিস্ফুটিত হয়। সেই দিকে লক্ষ রেখে যদি মেধার প্রবণতা অনুসারে শিক্ষার স্তর নির্ধারিত হয়, তাহলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের প্রতিভার বিকাশ লাভ হবে। আর যদি মেধা ও প্রবণতা অনুসারে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া না হয়, তাহলে ছেলেমেয়েদেরকে দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যাবে না (মঙ্গল কুমার, ২০১৬ : ১৯৫-১৯৬)।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করে আরও বলেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, যদি মেধা ও প্রবণতাকে শিক্ষার সব স্তরে যথার্থভাবে মর্যাদা দেওয়া না হয়, তাহলে ছেলেমেয়েদের মেধার উপযুক্ত বিকাশ সাধিত হবে না। (মঙ্গল কুমার, ২০১৬ : ১৯৬) কিন্তু ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর ঘাতকদের ষড়যন্ত্রে তিনি অকাল মৃত্যুবরণ করেন।

পরবর্তীতে তার ছোট ভাই ও সহকর্মী সন্তু লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার বিস্তারের পাশাপাশি পাহাড়িরা নিজেদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন করেছে।

সমাপনী বক্তব্য

জাতিতে আদিবাসী হলেও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চিন্তা-চেতনা ছিল দেশের সকল অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জন্য। তিনি ছিলেন বিনয়ী, মিতব্যয়ী, সাহসী, সৎ ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। তিনি যখন পাহাড়ি ছাত্র সমিতিতে যোগদান করেন তখন থেকে তার নেতৃত্বেই এই সমিতির ছাত্ররা তাদের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে তিনি যখন সাংসদ হন তখনও তিনি জাতীয় সংসদে আদিবাসীদের শিক্ষার উন্নয়ন এবং তাদের মাতৃভাষাসহ জাতিসত্তা সম্পর্কে বলেছেন। আর এভাবেই তার নেতৃত্বে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা সচেতনতার পাশাপাশি রাজনৈতিক সচেতনতাও গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে সজীব চাকমা বলেছেন—

> এম এন লারমার জন্ম, শিক্ষালাভ এবং আবির্ভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে কোন গতানুগতিক সাধারণ ঘটনা নয়। কেননা তিনিই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামকে নাড়িয়ে দিতে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ করতে, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে জাগরিত করতে, দেশের ও বিশ্বের দরবারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তুলে ধরতে সক্ষম হন। তার শিক্ষা লাভ ছিল অতীতের অন্য সবার চাইতে ব্যতিক্রম, তার কর্মজীবন, জীবন-দর্শন অন্য সবার চাইতে আলাদা। তিনি শিক্ষা লাভ করে কোন চাকুরী নিয়ে ব্যক্তিজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেছে নেননি। তিনি শিক্ষকতা করেও সেখানে আবদ্ধ থাকেননি, ওকালতি করেও উকিল হয়ে থাকেননি। কেননা তিনি ভাবতেন আরো অনেক কিছু, তিনি অনুভব করতেন আরো অনেক বিষয়। তিনি জানতেন বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষ ও নিপীড়িত জাতির সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের কথা। তিনি বুঝতেন আধুনিক সব রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা। তিনি ভাবতেন পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ ও নিপীড়ত-নির্যাতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের কথা, তাদের জাগরিত করবার ও সংগঠিত করবার কথা, তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের কথা। তিনি তাঁর এই চিন্তাভাবনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরতে এবং প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষমও হন। (সজীব, ২০১৬ : ৩৪)

এম এন লারমা ১৯৬০-র দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে অনেকের মনে নতুন নেতৃত্ব তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ঘটান যেন শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি সকলের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তিনি সহকর্মীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ভূমিকা রাখেন যার কারণে তার সহকর্মীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে পাহাড়ি অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেন, ফলে স্কুলগুলোতে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার হার পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১৭ সাল থেকে ৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিশুরা মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করছে, যার ফলে আদিবাসী শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম আদিবাসীদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধিতে আদিবাসীদের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

টীকা

১. ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম স্কুল। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত ভারতীয় পুলিশ ব্রিটিশ কর্মকর্তা R. H. Sneyd Hutchinson তাঁর *An Account of the Chittagong Hill Tracts* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬২ সালে। তিনি আরও বলেন—সেসময় স্কুলটিতে শিক্ষক ছিলেন দুইজন এবং শ্রেণি সংখ্যা ছিল দুইটি। স্কুলটিতে আদিবাসী ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হত।

২. খাগড়াছড়ি জেলার জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা যিনি ২০২১ সালে আদিবাসীদের মাতৃভাষা সংরক্ষণে অনন্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক পেয়েছেন।

সহায়কপঞ্জি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন (২০১১)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা। ওয়েবসাইট: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act

মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা., ১৯৭৪)। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাষার উন্নয়ন', খণ্ড-২, সংখ্যা-৩০, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক, ১৩ জুলাই, ১৯৭৪।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ (২০২২)। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রাঙ্গামাটি। ওয়েবসাইট: http://www.chtdb.gov.bd/

'মন্ত্রণালয়ের পটভূমি' (২০২২)। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা। ওয়েবসাইট : https://mochta.gov.bd/

মনোজ বাহাদুর গুর্খা (২০১৬)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের গুর্খা জনগোষ্ঠী*। হিমাদ্রী বাহাদুর গুর্খা, সেঞ্জিত বাহাদুর গুর্খা ও তনুশ্রী গুর্খা কর্তৃক প্রকাশিত, রাঙ্গামাটি।

আলীউর রহমান (২০১৫)। *রাঙ্গামাটির ইতিহাস ও ঐতিহ্য*। গতিধারা, ঢাকা।

শরদিন্দু শেখর চাকমা (২০০২)। *পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমার জীবন*, প্রথম খণ্ড। অঙ্কুর, ঢাকা।

মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ (মেসবাহ কামাল, ২০১৫)। *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগামের রাজনৈতিক সংগ্রাম*। অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ। ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা., ২০১৬)। *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম*, স্মারক গ্রন্থ। অংজয় মারমা 'সেই ভদ্রলোকটি', এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন, রাঙ্গামাটি।

পঙ্কজ ভট্টাচার্য (২০১৬)। 'জুম্ম জাতির স্থপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'। মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা.)। পূর্বোক্ত।

বিজয় কেতন চাকমা (২০০২)। 'স্মরণীয় বরণীয় মহান নেতার আদর্শ, *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি।

রেনী (২০১৬)। 'আমার চোখে মানবেন্দ্র লারমা', মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা.)। পূর্বোক্ত।

সজীব চাকমা (২০১৬)। 'এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ মানুষ মহান নেতা এম এন লারমা'। মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা.)। পূর্বোক্ত।

কীর্তি নিশান চাকমার সাথে লেখকের টেলিফোনে গৃহীত রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার, ২৮/৮/২০২০।

প্রফেসর মং শানু চৌধুরীর সাথে লেখকের টেলিফোনে গৃহীত রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার, ৩/৯/২০২০

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরার সাথে লেখকের টেলিফোনে গৃহীত রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৭/৮/২০২০।

শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার মহাথেরর সঙ্গে লেখকের টেলিফোনে গৃহীত রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২/৯/২০২০।

ঘোষণাপত্র (২০১৪)। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩১ তম মৃতুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি।

জয়ীতা চাকমা (২০১৪)। 'জুম্ম নারী আন্দোলনে এম এন লারমার অবদান ও আদিবাসী নারীদের বর্তমান অবস্থা', *১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি।

জ্যোতিপ্রভা লারমা (২০১৪)। 'মঞ্জু'র কিছু স্মৃতি কিছু কথা'। *এম. এন. লারমার মৃত্যুবার্ষিকী ২০১৪ স্মরণিকা*। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুবাষিকী পালন জাতীয় কমিটি, রাঙ্গামাটি।

তেজদীপ্ত চাকমা অজিত (২০১৪)। 'এম এন লারমা ঃ জুম্ম জাতীয় চেতনার স্ফুলিঙ্গ', *১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি।

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (২০০২)। 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ঃ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ!', *১০ নভেম্বর ৮৩ স্মরণে*। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি।

শ্রী জিমি (১৯৮৪)। 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন ও পাহাড়ী ছাত্র সমিতি', *১০ নভেম্বর-'৮৩ স্মরণে*। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি।

জুলিয়ান বম (২০২০)। 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংক্ষিপ্ত জীবনী', জুমজার্নাল। পার্বত্য চট্টগ্রাম। ওয়েবসাইট : https://www.jumjournal.com

Population and Housing Census Preliminary Report-2022 (2022). Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning. Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Dhaka.

R. H. Sneyd Hutchinson (1906). *An Account of the Chittagong Hill Tract*. The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta.

W W Hunter (1909). *A Statistical Account of Bengal*, Volume VI. Trubner and Co, London.

Indigenous and Tribal Populations Convention-1957. International Labour Organization, ওয়েবসাইট https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107